# সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম

## বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত

সম্পাদনা

ড. সুজন চক্রবর্তী

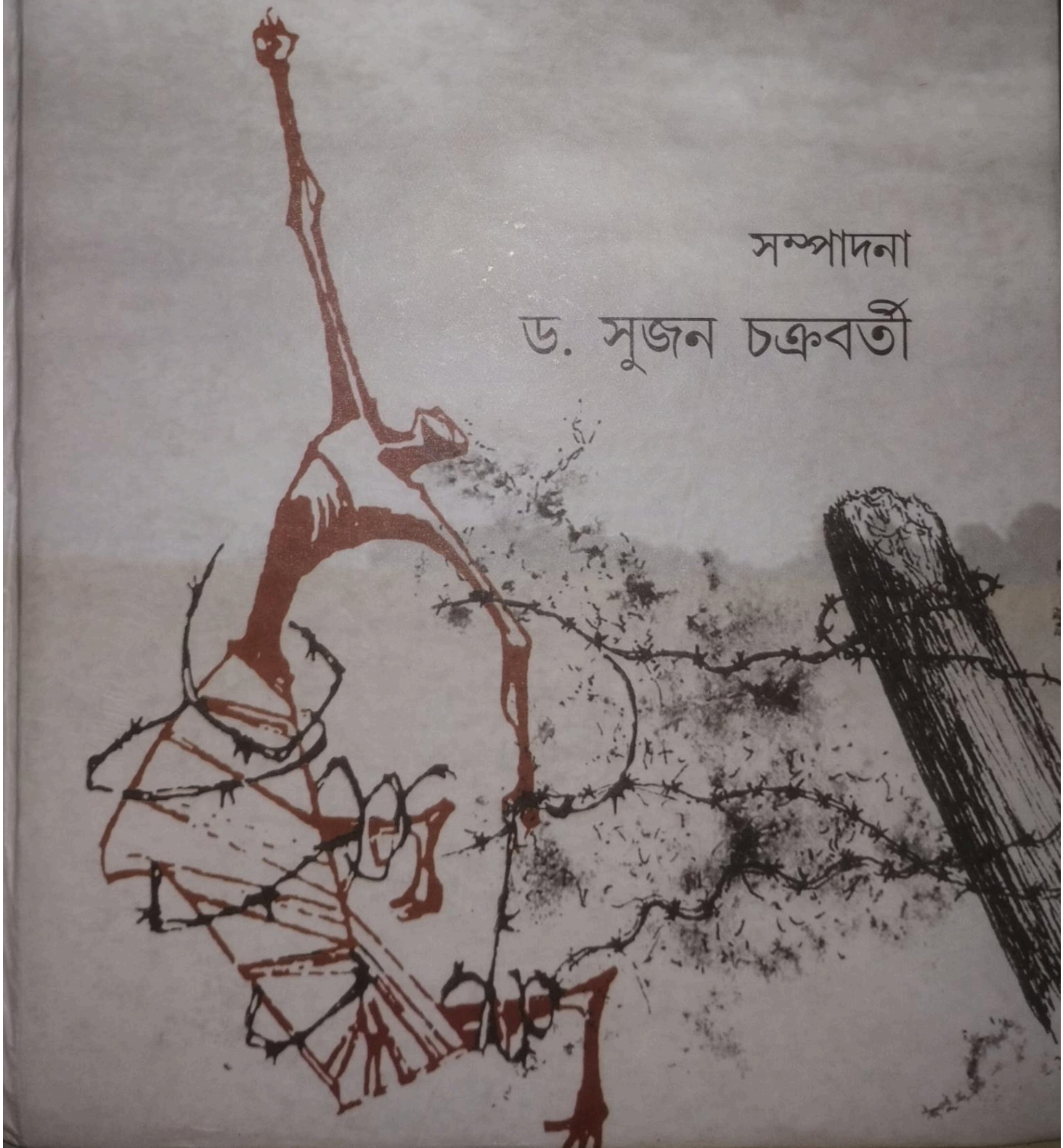

# সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম

## বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত

"কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশি তার চেয়ে?
কে সয়েছে এত গ্লানি রাণাঘাটে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পথে,
উড়িষ্যার তেপান্তরে, জনহীন দ্বীপান্তরে আর
হাওড়ার স্টেশানে?
অচল পয়সার মতো পরিত্যক্ত...

তবু বার বার
কে এমন ফিরে আসে, ঘর বাঁধে, কার এত আশা?
দারিদ্র্যের কাঁটাগাছে দুরন্ত স্বপ্নের রাঙাফুল
ফোটাতে কে জানে।"

*'নক্সী কাঁথার কাহিনী', মণীন্দ্র রায়*

এন বি এ

# সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম

## বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত

# সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম

## বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত


সম্পাদক

ড. সুজন চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

অধ্যাপক জীবন রঞ্জন ভট্টাচার্য, মধু দত্ত, সুমিত দে
সুভাষ মুখার্জি, দীপক ভট্টাচার্য, সংযুক্তা সিংহ
ড. অর্ণব ভট্টাচার্য

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ
(ইউ সি আর সি)



এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম
বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত
Simanta periye Sangram
Bastuhara Jiboner Itibritta

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২২

প্রকাশক
অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
email: nba.pvtltd@gmail.com
web: nationalbookagency.com

গ্রন্থস্বত্ব
সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ
(ইউ সি আর সি)
কেন্দ্রীয় কমিটি

প্রচ্ছদ
উজ্জ্বল রায়

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
এস. পি. কমিউনিকেশন্‌স প্রা. লি.
৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : ৩০০ টাকা

# উৎসর্গ

ছিন্নমূল মানুষের জীবনের অধিকার ও
মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অযুত সেনানীদের প্রতি

# ভূমিকা

১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারত গড়ে ওঠা এবং বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের মধ্য দিয়ে ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যার সূত্রপাত। সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের ইতিহাস ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আন্দোলন এক ও অভিন্ন ধারায় পরিচালিত হয়েছে। তবে অবশ্যই পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং বাংলায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যা এক ধারায় প্রবাহিত হয়নি।

১৯৫০ সালে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ গড়ে ওঠার আগে থেকেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবিতে পশ্চিমবাংলার সমস্ত বামপন্থী দলের পক্ষ থেকে আন্দোলন-সংগ্রামের কমতি ছিল না। বাল্যকালে বালিগঞ্জের গড়িয়াহাট মোড়ে স্বাধীনতার আগে থেকে থাকার সুবাদে ঢাকুরিয়া লেকের সামনে বেদীভবন ও সংলগ্ন এলাকায় প্রথম আমি পূর্ববাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু মানুষজনকে দেখেছি। অল্প জায়গায় অত মানুষ কী করে থাকছেন এই প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না। এরপর একবার চেনাজানা এক দাদার সাথে শিয়ালদহ স্টেশনে ছিন্নমূল মানুষের জীবনযাত্রা দেখে আমি হতবাক হয়েছি। তখন তো আমার সে অর্থে বিচারশক্তি ছিল না, তাই এ অবস্থা কেন আমি বুঝতাম না।

১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পরের দিন UCRC-র পক্ষ থেকে বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের হলেও বাস্তব সত্য পুলিশের পক্ষ থেকে প্ররোচনা সৃষ্টি করে গুলি চালিয়ে তৎকালীন সরকার আন্দোলনকারী কয়েকজনকে হত্যা করেছিল এবং ব্যাপক সংখ্যক আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যার মধ্যে উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা কমরেড অম্বিকা চক্রবর্তী, কুপার্স ক্যাম্পের তরুণ বাসিন্দা কমরেড দীনেশ মজুমদার, কমরেড হরিনারায়ণ অধিকারী-সহ উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলেন। শুনেছিলাম ধুবুলিয়া ক্যাম্পের কয়েকজনকে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এপার বাংলায় উদ্বাস্তু আন্দোলনের ইতিহাসে রক্তে লেখা অনেক গৌরবজনক গণআন্দোলনের অধ্যায় রয়েছে। এই ইতিহাসকে তুলে ধরার জন্য ইউসিআরসি-র এই উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য।

আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উদ্বাস্তুদের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছিল আবার অন্য রাজ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি করা ক্যাম্পে এ রাজ্যের উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল। একটি ম্যাগাজিনে এরকম এক কাহিনি পড়েছিলাম যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে একদল অসহায় উদ্বাস্তু মানুষকে ভিন রাজ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারা ভিন রাজ্যে যাবেন না বলে সোজা জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে বিধান রায়ের সরকার প্রমাদ গুনলেন। এরপর তাদের নদিয়ার তাহেরপুরে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হল। তখন তাহেরপুর জঙ্গলাকীর্ণ। সেই এলাকা পরিষ্কার করে বসতিযোগ্য করে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন পূর্ববাংলার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ। এই সমস্ত এলাকা পূর্ববাংলার ছিন্নমূল মানুষের দৃঢ় মানসিকতা, ব্যাপক ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে।

এই বাংলার ইতিহাসে অনেক উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি করেছে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের কর্মোদ্যোগ। তা চাষবাসের ক্ষেত্রেই হোক বা ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প অথবা বাগিচা তৈরির ক্ষেত্রেই হোক। এমনকী উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরে উদ্বাস্তু মানুষের একদিকে জীবনযন্ত্রণা, অন্যদিকে গঠনমূলক কাজের অনেক উদাহরণ আমার চোখে দেখা। তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের বোরগাঁ, পারেলকোট, কাঁকের প্রভৃতি এলাকায় প্রতিকূল পরিবেশে উদ্বাস্তুদের নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম আমি দেখেছি। এককথায় উদ্বাস্তু মানুষ যেখানেই অবস্থান করেছেন সেখানেই তারা একদিকে তাদের দৃঢ়চেতা মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে লড়াই করেছেন আবার সৃষ্টির মহান কর্মযজ্ঞে যুক্ত হয়েছেন। এইসব কাহিনি অল্পকথায় বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যারা পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু মানুষের জীবনগাথা এবং তাদের প্রিয় সংগঠন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের কিছু কথা তুলে ধরার প্রয়াসী হয়েছেন তাদের জানাই সেলাম।

উল্লেখ্য, দিল্লির সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের মাধ্যমে উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করেছে, বর্তমান সরকারের সময়ে যে প্রচেষ্টা খুবই দুর্বল। দেশভাগের পর ওপার বাংলার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের অতীত দিনের সংগ্রাম এবং পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনের বিকাশে ইউসিআরসি-র ভূমিকা সম্পর্কে এখনকার তরুণ প্রজন্মের অবহিত হওয়া আমার বিচারে জরুরি প্রয়োজন। কমরেড সুজন চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য নেতৃত্বের এই উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি এবং বইটির বহুল প্রচারের প্রত্যাশা করছি।

(বিমান বসু)

# মুখবন্ধ

এই উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা এসেছে দেশভাগকে সাথে নিয়ে। আর দেশভাগের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে দাঙ্গা, হিংসা, জীবনহানি ও বাস্তুভিটে ত্যাগ করার মর্মযন্ত্রণা। ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়াতে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার বিষয়টি ছিল গৌণ। মুখ্য হয়ে উঠেছিল যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল। তাই ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা-সমঝোতার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি ১৯৪৭সালের আগস্ট মাসে ভারতকে ভাগ করে দুটি সার্বভৌম দেশের জন্ম দেওয়া হয়। ক্ষমতাদখলের রাজনীতির জটিল আবর্তে পড়ে বাংলা ও পাঞ্জাবে যে বিভাজন ঘটে ছিল আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে তা অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে।

ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে দেশের বিভাজনের ফলে অগণিত মানুষ এক লহমায় 'নিজভূমে পরবাসী' হয়ে যান। র‍্যাডক্লিফের আঁকা অলীক সীমান্তের দু-পারেই সাম্প্রদায়িক হিংসা, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে নিরাপত্তার খোঁজে পা বাড়ান দুই বঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে বাস্তুহারা মানুষের এই স্রোত দেশভাগের পর কয়েক দশক ধরে বহমান থেকেছে। ১৯৮০-৮১ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ৮০ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষ চলে আসেন। বেসরকারি মতে সেই সংখ্যা এক কোটিরও বেশি। এই বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশভাগের অভিঘাতে নিজেদের চেনা পরিমণ্ডল থেকে ছিটকে পড়েন। অজানা, অচেনা পরিবেশে নতুনভাবে জীবন গড়ার সংগ্রামে তারা কী নিদারুণ কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছেন, কারাই বা এই লড়াইয়ে রসদ যুগিয়েছেন এবং বাস্তুহারা মানুষকে অধিকার অর্জন করতে সহায়তা করেছেন সে বিষয়ে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ থাকলেও তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি।

দেশভাগের সময় হাজারো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের চোখে বাংলার বাস্তুহারারা ছিলেন অবাঞ্ছিত। তাদের প্রতি সরকারের আচরণ ছিল অত্যন্ত অমানবিক। তাই বাস্তুহারা মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজেরাই দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সরকারের

হৃদয় গলানোর ব্যর্থ চেষ্টা না করে সংগ্রামের মাধ্যমে অধিকার ছিনিয়ে আনতে তৈরি হয় উদ্বাস্তুদের নিজস্ব সংগঠন সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ বা ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল (ইউসিআরসি)।

বাস্তুহারাদের সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এ রাজ্যের বামপন্থীরা। এভিকশন বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে জীবনজীবিকার জন্য লড়াই এবং তার সাথে নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম সব ক্ষেত্রেই আইনসভার ভেতরে ও বাইরে বামপন্থীদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। আজকাল অনেকে বলবার চেষ্টা করেন যে উদ্বাস্তু জনতা নাকি এ রাজ্যে বামপন্থীদের ক্ষমতালাভের সোপান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অথচ ইতিহাস এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে। উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রামের পরতে পরতে জড়িয়ে থেকেছেন বামপন্থী কর্মী-সংগঠকরা। এদেশে প্রথম উদ্বাস্তুদের নিঃশর্ত দলিল প্রদান থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু কলোনির উন্নয়নের জন্য লাগাতার প্রয়াস করেছে বামফ্রন্ট সরকার। তার সাথে কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য পাওয়ার লড়াইও জারি রেখেছিল। আজ আমাদের দেশে ৬০-এর দশক থেকেই এবং রাজ্যে ২০১৬ সাল থেকেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর বলে আর কোনো আলাদা দপ্তর নেই। পাট্টা বিলির কাজ অবহেলিত। আছে কেবল অসত্য কথা, মরিচঝাঁপির ষড়যন্ত্র ও উদ্বাস্তুদের অসহায়তাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের উদগ্র প্রয়াস। তাই বাস্তুহারাদের অধিকার অর্জনের লড়াইকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরবার প্রয়োজনীয়তা থেকেই জন্ম নিয়েছে ইউসিআরসি রাজ্য কমিটির নিবেদন "সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম – বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত"।

দেশভাগের পর থেকে উদ্বাস্তুদের অধিকার অর্জনের যে লড়াই চলছে তা নানা বাঁক ও মোড়ের মুখোমুখি হয়েছে। জবরদখল কলোনি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে নাগরিকত্ব অর্জনের লড়াইয়ের এই জটিলতা ও বহুমাত্রিকতাকে দুই মলাটের মধ্যে ধরে ফেলা নিঃসন্দেহে খুব দুরূহ কাজ। তবু এই কাজে ইউসিআরসি আন্তরিকতার সাথে অগ্রসর হয়েছে কেননা বাস্তুহারা মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইউসিআরসি-র পক্ষ থেকে বাস্তুহারাদের মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামের যে রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক। এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য পাঠকমণ্ডলীর সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। বাস্তুহারাদের জীবন-সংগ্রাম সম্পর্কিত তথ্য, ছবি, নথিপত্র ইত্যাদি আমাদের সরবরাহ করলে আমরা তা পরবর্তীকালে সঙ্কলিত করব। আমরা আশাবাদী যে আমাদের এই আন্তরিক প্রয়াস পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং তাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আগামী দিনে বাস্তুহারা আন্দোলনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

ইতিহাসের গভীর থেকে এই তথ্য তুলে আনতে সরকারি নানা রিপোর্ট ও আদেশনামার পাশাপাশি ইউসিআরসি-র বিভিন্ন সম্মেলনের রিপোর্ট, পুনর্বাসন পত্রিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু ত্রাণ পুনর্বাসন কর্মচারীর সমিতির কাছ থেকে প্রাপ্ত নানা তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাহায্য নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংকলিত সেই সময়ের নানা প্রতিবেদন এবং বক্তৃতার। উদ্বাস্তু আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, অনিল সিংহ, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর মুখার্জি, প্রশান্ত শূর, তুষার সিংহ, কান্তি বিশ্বাস প্রমুখের লিখিত নানা গ্রন্থ এবং নিবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উদ্বাস্তু আন্দোলনের এইসব নেতাদের নানান অভিজ্ঞতা এবং তথ্য এই পুস্তক রচনার কাজে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছে।

উদ্বাস্তু আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষক অধ্যাপক ড. অর্ণব ভট্টাচার্য এই পুস্তক রচনায় যেভাবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন এবং ড. নিতীশ বিশ্বাস, ড. প্রণব বর্মন, অধ্যাপক প্রশান্ত দাস, অধ্যাপক প্রণবেশ তালুকদার ও সাংবাদিক-গবেষক গৌতম রায় যেভাবে প্রতিটি তথ্য খুঁটিয়ে দেখে পুর্ণ সহযোগিতা করেছেন তা এই দলিলটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

ইউসিআরসি-র রাজ্য নেতৃত্ব এরকম একটি প্রকাশনার সমস্ত দায়ভার ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। নানা ধরনের তথ্য জুগিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক জীবনরঞ্জন ভট্টাচার্য, মধু দত্ত, রবি গাঙ্গুলী, সুভাষ মুখার্জি, সত্যরঞ্জন দাস, দীপক ভট্টাচার্য, সংযুক্তা সিংহ-সহ আরও অনেকেই। সবার নাম উল্লেখ করার অপারগতা স্বীকার করে নিচ্ছি। এদের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া এই প্রকাশনা সম্ভব ছিল না। এদের সবাইকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে বলব, এই প্রকাশনাটি যতটা না একটি গ্রন্থ, তার চাইতে অনেক বেশি একটি জীবন্ত দলিল। বাংলার সমাজজীবনের প্রবহমানতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস। আন্দোলনের শরিক বন্ধুরা এবং পাঠকবৃন্দের যাতে এই প্রকাশনাটি কাজে লাগে সেটাতেই আমাদের আগ্রহ। আশাকরি সেভাবেই এই প্রকাশনাটি সমাদৃত হবে।

সুজন চক্রবর্তী

(ড. সুজন চক্রবর্তী)